সহযোগী শহর হতে ব্যর্থ বাগডোগরা-মাটিগাড়া

কলকাতার সহযোগী শহর হিসেবে গড়ে উঠেছে রাজারহাট–নিউটাউন। যদি রাজ্য ছাড়িয়ে দেশের দিকে তাকানো যায়, তবে রাজধানী দিল্লির সহযোগী শহর হিসেবে নয়ডা ও গুরুগ্রামের উত্থান তো চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতো। গুরুত্বের দিক থেকে বিচার করলে এরাজ্যে কলকাতার পরেই এখন নাম উঠে আসে শিলিগুড়ি শহরের। আয়তনে শিলিগুড়ি খুব একটা বড় নয়। এর সহযোগী হিসেবে সংলগ্ন মাটিগাড়া, শিবমন্দির, বাগডোগরা এলাকাকে নিয়ে গড়ে উঠতেই পারত আরেকটা শহর। কিন্তু তা হয়নি।

বহুতলগুলিতে ভিড় বাড়ছে উচ্চমধ্যবিত্তদের। –সংবাদচিত্র

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৩ মে : কলকাতা বিমানবন্দরের গণ্ডি ছাড়িয়ে ডান হাতে খানিকটা এগোলেই আজকের নিউটাউন। চোখে পড়বে একের পর এক আকাশচুম্বী অট্টালিকা। চওড়া রাস্তায় হুহু করে ছুটে চলছে গাড়ি। অথচ নয়ের দশকের শুরুতেও ধু-ধু জমি আর ভেড়ি ছাড়া সেখানে বিশেষ কিছুই ছিল না।

এবার চলে আসা যাক শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন মাটিগাড়া, বাগডোগরা, শিবমন্দিরের দিকে। চওড়া ফ্লাইওভার হয়েছে। এশিয়ান হাইওয়ে-২ হয়েছে। কিন্তু সামনের সেই খোলস ছাড়িয়ে অল্প ভেতরে ঢুকলেই পরিকাঠামোর কঙ্কালটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। পুরোটাই পঞ্চায়েত এলাকা। পাথরঘাটা, আঠারোখাই এবং লোয়ার ও আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে এই এলাকাগুলি। রাজারহাট ও ভানগড় গ্রাম দুটিকে নিয়ে যে কলকাতার পাশেই আরও একটা শহর গড়ে তোলা যায়, নয়ের দশকে সেই পরিকল্পনা নিয়েছিল তৎকালীন রাজ্য সরকার। অথচ শিলিগুড়ির এই এলাকাগুলি নিয়ে পুরসভা গঠনের দাবি উঠলেও কাজ এগোয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দারাই বলছেন, শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন এই এলাকার চরিত্র আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে। মাটিগাড়া ব্লকের আঠারোখাই এবং পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একের পর এক আকাশচুম্বী ফ্ল্যাট গড়ে উঠছে। চাকচিক্য ও দামের দিক থেকে সেসব রীতিমতো পাল্লা দিচ্ছে খাস শিলিগুড়ি শহরের বহুতলগুলির সঙ্গে। পঞ্চায়েত এলাকার সেসব ফ্ল্যাট বিক্রিও হচ্ছে হুহু করে। কেবল শিলিগুড়ি নয়, সেসব ফ্ল্যাটের ক্রেতারা দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং থেকে আসছেন। আসছেন দক্ষিণবঙ্গ বা অসম, মণিপুর অথবা সিকিম থেকে। কিন্তু যে কোনও বড় শহরের সঙ্গে টক্কর দেওয়া সেসব বহুতলগুলির বাসিন্দারা কিন্তু সুষ্ঠু নাগরিক পরিষেবা পাচ্ছেন না। নাগরিক পরিষেবার বলতে বোঝায় পানীয় জল, রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা, বর্জ্য সংগ্রহের মতো বিষয়গুলি। কিন্তু নতুন নতুন গড়ে ওঠা সেসব বহুতলগুলির বাসিন্দাদের অভিযোগ, সেখানে নিয়মিত নিকাশিনালা সাফাই করা হয় না। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে বর্জ্য নিয়ে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। জল সরবরাহের কোনও সুবন্দোবস্ত নেই। বাধ্য হয়ে ফ্ল্যাটগুলির আবাসিকরাই বোরিং করে জলের ব্যবস্থা করে নেন। রাস্তাঘাটের অবস্থাও তথৈবচ। কদমতলার (ডিগলিজোত) এরকমই একটি ফ্ল্যাটের আবাসিক জেপি দেওয়ান বলেন, 'আমাদের এখানে নিজস্ব উদ্যোগে বোরিং করে জলের ব্যবস্থা করে নিয়েছি। দৈনন্দিন আর্বজনা ফ্ল্যাট চত্বরে বালতি করে জমা করে রাখি। আমরাই ফ্ল্যাটের সোসাইটির পক্ষ থেকে লোক রেখেছি। তিনি আবর্জনা নিয়ে যান। কোথায় ফেলেন বলতে পারব না। স্থানীয় পঞ্চায়েতের তরফ থেকে কোনওরকম পরিষেবাই আমরা পাই না।'

পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার উত্তরায়ণ, ঘোকলাজোত, মোটাজোত, বারোঘরিয়া, ত্রিপালিজোত, পাসকেলগুড়ি, মীরজাংলা, নিউচামটা, বান্দ্রিজোত, হিমাঞ্চল বিহার, আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কদমতলা (ডিগলিজোত), রবীন্দ্র সরণি, বিবেকানন্দপল্লি, সারদাপল্লি, সূর্য সেন পল্লি, ইউনিভার্সিটি অ্যাভিনিউ, রামকৃষ্ণ সরণির মতো এলাকাগুলি বিগত কয়েক বছরে বড় বড় ফ্ল্যাটে ভরে গিয়েছে। এইসব ফ্ল্যাটের ক্রেতাদের অধিকাংশই শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, ব্যবসায়ীদের মতো উচ্চমধ্যবিত্ত। এমনই একটি বহুতলের বাসিন্দা, পেশায় চিকিৎসক এসকে মুখোপাধ্যায় বলেন, আমাদের কাছ থেকে সম্পত্তি কর এবং অন্যান্য বাবদ যে পরিমাণে কর নেওয়া হয় সেই তুলনায় কোনও পরিষেবাই আমরা পাই না। আমরা চাই, এই এলাকা পুরসভায় উন্নীত করা হোক।

মাটিগাড়ায় উত্তরায়ণের বিশাল আবাসনটি গড়ে উঠেছে দীর্ঘদিনই। চাঁদমণি–উত্তরায়ণ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সরবন চৌধুরী বলেন, 'এখানে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কোনও পরিষেবা দেওয়া হয় না। রাস্তা মেরামত, জল, পথবাতি, আর্বজনা ফেলার সমস্ত খরচ সোসাইটিই বহন করে।'

পরিষেবা না মেলার ফলে একদিকে যেমন বাসিন্দারা সমস্যায় পড়ছেন, তেমনই সমস্যায় পড়ছে স্থানীয় পঞ্চায়েতও। আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান অভিজিৎ পাল বলেন, 'আবাসনের বর্জ্য যেখানে–সেখানে ফেলা হচ্ছে। নদী এমনকি রাস্তার পাশেও ফেলে দিচ্ছে। এতে দূষণ বাড়ছে। এখানে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প নেই। তাতেই সমস্যা হচ্ছে।'

পরিকাঠামোর অভাবের রেশ পড়ছে পরিবেশের ওপরেও। স্থানীয় পরিবেশপ্রেমী বিপ্লব রায় বলেন, 'একটি পরিবারে প্রতিদিন গড়ে দু'কেজি বর্জ্য হয়। এই বর্জ্যগুলি নদীতে ফেললে দূষণ হবে। আবার ক্রমাগত বেহিসেবিভাবে ভূগর্ভস্থ জল তুলে নিলে জলস্তর নেমে যাবে। শহর হলে হয়তো এসব পরিকাঠামো হবে। অবিলম্বে সমস্যাগুলি নিয়ে ভাবা না হলে আগামীদিনে ভয়ানক বিপদ হতে পারে।'

সংখ্যা বাড়ছে বহুতলের

"আমরা ২০১০ সালে রাজ্যের মন্ত্রীসভায় আঠারোখাইকে পুরসভায় উন্নীত করার প্রস্তাব পাশ করেছিলাম। তার পরে তৃণমূল ক্ষমতায় আসে। আর কাজ এগোয়নি।
–অশোক ভট্টাচার্য, *প্রাক্তন পুরমন্ত্রী*

"আমি এই এলাকাকে পুরসভা করার দাবি বিধানসভায় অবশ্যই তুলব।
–আনন্দময় বর্মন, *নবনির্বাচিত বিধায়ক*

"আমি বহুবার বিধানসভায় এই এলাকাকে নিয়ে একটি পুরসভা গঠন করার দাবি তুলেছি। কিন্তু সরকারের তরফে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।
–শংকর মালাকার, *প্রাক্তন বিধায়ক*

অ্যাম্বুল্যান্স চালকদের নিয়ে অভিযোগ চিকিৎকদের

সংক্রামিতদের অক্সিজেন জোগানে অমানবিকতা

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : চিকিৎসকরা বলছেন একরকম, অ্যাম্বুল্যান্স চালকরা করছেন অন্যরকম। আর এতেই মৃত্যুর মুখে চলে যাচ্ছেন রোগীরা। এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে রোগী স্থানান্তরের সময় বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স চালকদের একটা বড় অংশই রোগীদের সঠিকভাবে অক্সিজেন দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে। আর এর জেরে রোগীদের মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে। মেডিকেলের চিকিৎসকদের একাংশ বলছেন, অন্যান্য জেলা থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে এমন অনেক রোগী মেডিকেলে নিয়ে আসার পথে মাঝরাস্তাতেই মারা যাচ্ছেন। অক্সিজেনের মাত্রা সঠিকভাবে না পাওয়ার জন্যই এমনটা ঘটছে। আর এজন্য অ্যাম্বুল্যান্স চালকদের একাংশকে দায়ী করছেন চিকিৎসকরা। তাঁদের অভিযোগ, যে পরিমাণ অক্সিজেন একজন রোগীকে দেওয়ার কথা, সেই অক্সিজেন পাঁচজনকে দিচ্ছে অ্যাম্বুল্যান্সগুলি। যার ফল মারাত্মক হচ্ছে। এ ব্যাপারে কড়া নজরদারির দাবি উঠেছে। দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ প্রলয় আচার্য বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

শিলিগুড়ি শহর এবং শহরতলি মিলিয়ে কয়েক হাজার অ্যাম্বুল্যান্স চলাচল করে। এর মধ্যে অনেক অ্যাম্বুল্যান্সেই অক্সিজেন দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। মূলত এই অ্যাম্বুল্যান্সগুলিতেই করোনায় সংক্রামিত বা করোনার উপসর্গযুক্ত রোগীদের আনা, নেওয়ার কাজ করা হচ্ছে। অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া নিয়ে একটা অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। জেলা প্রশাসন নির্ধারিত ভাড়ার তালিকা কোনও অ্যাম্বুল্যান্স চালকই মানেন না বলে অভিযোগ। এরই পাশাপাশি অভিযোগ উঠছে, অ্যাম্বুল্যান্সে রোগীর প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পাওয়া যাচ্ছে না।

কী কী অভিযোগ

- **যে পরিমাণ অক্সিজেন একজন রোগীকে দেওয়ার কথা, সেই অক্সিজেন পাঁচজনকে দিচ্ছে অ্যাম্বুল্যান্সগুলি**
- **অন্য জেলা বা অন্য হাসপাতাল থেকে মেডিকেলে রোগীকে নিয়ে আসার সময় রাস্তাতেই তাঁরা মারা যাচ্ছেন**
- **অ্যাম্বুল্যান্সে বাইপ্যাপ থাকে না বলেও প্রয়োজনীয় পরিমাণ অক্সিজেন দিতে সমস্যা হচ্ছে**

অভিযোগ উঠেছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অ্যানাস্থিজিওলজিস্ট বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসার ডাঃ উদয়ন মজুমদার বলেন, 'ফ্লো মিটার দিয়ে অক্সিজেনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। তার পরিমাণ কম-বেশি হলে রোগীর শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে পারে। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখছি যে, অন্য জেলা বা অন্য হাসপাতাল থেকে মেডিকেলে রোগীকে নিয়ে আসার সময়ই রাস্তাতেই তাঁরা মারা যাচ্ছেন। পরে খতিয়ে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, অক্সিজেনের মাত্রা ঠিকঠাক ছিল না বলেই এমনটা হচ্ছে।'

আইএমএ'র শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক তথা একটি নার্সিংহোমের কর্ণধার ডাঃ শেখর চক্রবর্তীও একই কথা বলেন। তিনি বলেন, 'নার্সিংহোমে আসার আগে সঠিকভাবে অক্সিজেন না পাওয়ায় রোগীর শারীরিক অবস্থা খারাপ হচ্ছে। হতে পারে এটা অ্যাম্বুল্যান্সেই হচ্ছে বা তার আগে থেকেও এই সমস্যা থাকতে পারে।'

শেখরবাবু আরও বলেন, 'হয়তো কোনও হাসপাতালে রোগীর শরীরে অক্সিজেন দিতে বাইপ্যাপ চলছিল। সেই রোগীকে অন্য হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে সরানোর সময় অ্যাম্বুল্যান্সে অক্সিজেন দেওয়া হল। সেখানে তো বাইপ্যাপ থাকে না। শুধুমাত্র নেসাল ক্যানিউলা ব্যবস্থা রয়েছে। এর মাধ্যমে মিনিটে ৩-৫ লিটারের বেশি অক্সিজেন শরীরে যায় না। তাহলে যে রোগীর শরীরে মিনিটে ১০ লিটার বা তার বেশি অক্সিজেন প্রয়োজন তাঁর তো অ্যাম্বুল্যান্সের অক্সিজেনে কাজ হবে না।'

শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়েই বেশিরভাগ রোগী অ্যাম্বুল্যান্সে হাসপাতালে যান। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকরা প্রতি মিনিটে রোগীদের ঠিক কতটা অক্সিজেন প্রয়োজন, তা বলে দেন। কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্স চালকরা অক্সিজেন বাঁচিয়ে রাখার জন্য রোগীর শরীরে অক্সিজেন সরবরাহের মাত্রা কমিয়ে দিচ্ছেন বলে

অনুমতি ছাড়াই হোটেলে কোভিড চিকিৎসা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : অবৈধভাবে হোটেল ভাড়া নিয়ে সেখানে রোগীদের রেখে চিকিৎসার নামে প্রহসন চলছে। প্রধাননগর এলাকার একাধিক বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ নিয়ে সরব হয়েছে বিভিন্ন মহল। প্রশ্ন উঠেছে স্বাস্থ্য দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও। আদৌ কি স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমতি নিয়ে হোটেলে রোগী রাখা হচ্ছে? যদি না হয়ে থাকে তাহলে কেন সংশ্লিষ্ট বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, সেই প্রশ্নও উঠছে। শুধু সেখানে রোগী রাখাই নয়, লক্ষ লক্ষ টাকা বিল হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কেউ ফোন ধরেনি। মেসেজেরও উত্তর দেয়নি। দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ প্রলয় আচার্য বলেন, 'আমরা বিষয়গুলি খতিয়ে দেখছি। বিভিন্ন জায়গায় সারপ্রাইজ ভিজিট করা হচ্ছে। অন্যায়ভাবে কেউ হোটেলে নার্সিংহোম খুলে বসলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

প্রধাননগরে দুটি বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক হোটেল এবং লজ ভাড়া নিয়ে সেখানে করোনা সংক্রামিত রোগীদের রেখে চিকিৎসার অভিযোগ উঠছে। পুরোনো প্রধাননগর থানা সংলগ্ন একাধিক হোটেল এবং লজ ভাড়া নিয়েছে বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পাহাড় এবং সমতলের প্রচুর করোনা সংক্রামিত রোগী এই বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার জন্য আসছেন। যে সংক্রামিতদের উপসর্গ নেই বা খুবই কম উপসর্গ রয়েছে তাঁদের হোটেলে বা লজে রাখা হচ্ছে। উপসর্গযুক্ত রোগীদেরই শুধুমাত্র হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে ভর্তি করা হচ্ছে।

এমন একাধিক রোগীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, খুব অসুস্থ কোনও রোগীকে এই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করার পরে দু-তিনদিন অন্তর্বিভাগে রাখা হচ্ছে। রোগী একটু সুস্থ হলেই তাঁকে হোটেলে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আবার হোটেলে থাকাকালীন কেউ হঠাৎ অসুস্থ হলে তাঁকে অন্তর্বিভাগে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

অথচ ভাড়া করা হোটেলে না রয়েছে কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা, না রয়েছে অক্সিজেনের সরবরাহ। তবুও রোগীদের ৭-১০ দিন রেখে তারপর লালার নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এলে মোটা টাকা নিয়ে ছুটি দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি কার্সিয়াংয়ের এক রোগীকে হোটেলে রেখেই ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বিল নিয়েছে প্রধাননগরের একটি বেসরকারি হাসপাতাল। অথচ তাঁকে ওষুধ, ইনজেকশন তেমন কিছুই দেওয়া হয়নি। শুধু প্যারাসিটামল এবং তিন বেলা খাবার দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ উঠছে, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় এভাবে পুরোপুরি বেআইনি কাজ করে চললেও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি হাসপাতালগুলির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি প্রশাসন। চিকিৎসকদেরই একাংশ বলছেন, কোনও আইনেই এভাবে হোটেলে রোগী রেখে চিকিৎসা করা যায় না। তবে, স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমতি নিয়ে বিনে পয়সায় বিভিন্ন সংস্থা এভাবে আইসোলেশন সেন্টার তৈরি করে উপসর্গহীন রোগী রেখে পরিষেবা দিতে পারে।

জলদাপাড়া কাণ্ডে ধৃত আরও এক

মাদারিহাট, ১৩ মে : জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে গন্ডার শিকার কাণ্ডে বড়সড়ো সাফল্য পেল বন দপ্তর। অভিযান চালিয়ে দুটি সাইলেন্সার লাগানো রাইফেল সহ একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার বনকর্মীরা হানা দেন সোনারপুরের কাছে তপসিখাতা গ্রামে। সেই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক দেবদর্শন রায়। সঙ্গে ছিলেন কোদালবস্তি রেঞ্জ ও চিলাপাতা রেঞ্জের বনকর্মীরা। যদিও এব্যাপারে তদন্তের স্বার্থে বেশি কিছু জানাতে চাননি জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বনাধিকারিক দীপক এম। তিনি বলেন, '২৪ রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। যে রাইফেল দিয়ে গন্ডারটিকে মারা হয়েছিল সেটিও উদ্ধার করা হয়েছে।'

গন্ডার মারায় ব্যবহৃত রাইফেল উদ্ধার

প্রসঙ্গত, এই নিয়ে গন্ডার শিকার কাণ্ডে চারজনকে গ্রেপ্তার করল বন দপ্তর। আগেই ধরা পড়া তিনজন জেল হেপাজতে রয়েছে।

জানা গিয়েছে, এদিন তপসিখাতায় এক ব্যক্তির বাড়িতে হানা দেন বনকর্মীরা। ওই ব্যক্তির বাঁশবাগানের পাশে মাটিতে পুঁতে রাখা দুটি সাইলেন্সার রাইফেল উদ্ধার করা হয়। সেইসঙ্গে তাকে গ্রেপ্তারও করা হয়। তদন্তের স্বার্থে ধৃত ব্যক্তির নাম জানাননি বনকর্তারা। জানা গিয়েছে, আগ্নেয়াস্ত্র দুটি প্লাস্টিকে মুড়িয়ে বাঁশবাগানের ধারে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছিল।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার যাকে ধরা হয়েছে সে সরাসরি গন্ডার শিকারের সঙ্গে জড়িত ছিল। চোরাশিকারিদের যে গ্যাংটি ওই কাণ্ড ঘটিয়েছে, তার যে মাস্টারমাইন্ড, সে এদিন ধৃত ব্যক্তির আত্মীয়। তবে দলের মাস্টারমাইন্ড এখনও অধরা রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৪ এপ্রিল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের চিলাপাতা রেঞ্জের বানিয়াবিটের জেপি ওয়ান ও টু কম্পার্টমেন্টের মাঝে একটি পূর্ণবয়স্ক গন্ডারের খড়্গবিহীন দেহ উদ্ধার হয়। গন্ডারের দেহে খড়্গ না থাকায় বন দপ্তরের কর্তীরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেন যে সেটি চোরাশিকারিদের কাজ। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবারের ঘটনা বড়সড়ো সাফল্য বলে মনে করছেন বনকর্তারা।

ক্ষুধার জ্বালা।। *সিতাই বাজারে আবর্জনার মধ্যে পড়ে থাকা তরমুজ খাচ্ছেন ভবঘুরে। ছবি : পার্থসারথি রায়*

করোনায় মৃতের দেহ পড়ে ঘরে

নকশালবাড়ি, ১৩ মে : মৃত্যুর পর প্রায় দশ ঘণ্টা পড়ে থাকল এক যুবকের দেহ। করোনার ভয়ে দেহ সৎকারে এগিয়ে এলেন না পরিজন ও প্রতিবেশীরা। নানা টালবাহানার পর নকশালবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এক যুবকের দেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা হল। হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহাসিংজোত এলাকার ঘটনা। ওই এলাকার বাসিন্দা অমিত গোন (৩২) দীর্ঘদিন ধরে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত ছিলেন। নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। গত সোমবার অমিতের দেহে করোনার উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসকরা তাঁকে হোম আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দেন। বুধবার রাত তিনটে নাগাদ অমিত মারা যান। কিন্তু করোনার ভয়ে বাড়ির কোনও সদস্যই দেহের কাছে যাননি। বাড়ির উঠোনে দেহটি পড়েছিল। আতঙ্কে প্রতিবেশীরাও কেউ আসেননি। স্থানীয় বাসিন্দা তথা নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মাধব সরকার বলেন, 'নিজের পরিবারের কেউ সৎকারের জন্য সহযোগিতা করল না। ব্লক প্রশাসনকে জানানোর পরেও দীর্ঘ টালবাহানা করা হয়।' শেষ পর্যন্ত ব্লক প্রশাসনের একটি অ্যাম্বুল্যান্সে করে শিলিগুড়ির সাহুডাঙ্গি শ্মশানে দেহটি সৎকারের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রামীণ সম্পদকর্মীরা এলাকা স্যানিটাইজ করেন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, অমিত গোন পেশায় দিনমজুর ছিলেন। অন্যের জমিতে কৃষিকাজ করেই সংসার চালাতেন তিনি। বাড়িতে ৬৫ বছরের মা, স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে। বড় দাদা ভুবেন গোন পরিবার নিয়ে আলাদা থাকেন। ভুবেনবাবু বলেন, 'ভাইয়ের করোনায় মৃত্যু হয়েছে। আমরা সকলেই আতঙ্কে আছি। সৎকারের জন্য কেউ আমাকে দেহের ধারেকাছে যেতে বলেনি।' মৃতের স্ত্রী মনোময়ী গোন বলেন, 'বয়স্ক শাশুড়ি, দুই সন্তানকে নিয়ে না খেয়েই দিন কাটাচ্ছি।'

অন্যদিকে, নকশালবাড়ির ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কুন্তল ঘোষ বলেন, 'অমিতের টিবি ও করোনা– দুটোই ধরা পড়েছিল। আমরা অভিযোগ পাওয়ার পরেই মৃতদেহের সৎকারের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের পাঠাই। সবকিছু সরকারের তরফেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে বিধি মেনে পরিবারের দুজন সদস্য সৎকারের সময় উপস্থিত থাকতেই পারেন।'